মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানরীতির সাহিত্য

সনৎকুমার নস্কর

মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানরীতির সাহিত্য - রাজাদের কবি - পোষণ ও কবিদের রাজ - তোষণ

যে - কোন জাতির বেড়ে ওঠার মূলে অন্যান্য অনেক উপকরণের মতো বিশেষ ভূমিকা পালন করে ইতিহাস - চেতনা। আত্মসচেতনা গড়ে তোলার অন্যতম হাতিয়ার হল ইতিহাস। ঠিক দর্পণে যেমন আমরা প্রতিবিম্বে দেখি আমাদের সমগ্র অবয়বকে, তেমনি ইতিহাসের আয়নায় একটা দেশ, একটা জাতি চকিতে দেখে নিতে পারে তার পূর্বাপর চেহারা। ইতিহাসের এই ভূমিকার কথা মাথায় রাখলে অতীতের বিস্মৃতপ্রায় ঘটনাবলীর ক্রমান্বয়িক উদ্‌ঘাটনই হয়ে দাঁড়ায় একজন সৎ দায়বদ্ধ ঐতিহাসিকের অবশ্য - কৃত্য। এ অনুভব আধুনিক কালের কোন নবজাগরণিক চেতনা নয় ; এ তত্ত্ব জানা ছিল কমবেশি প্রাচীনকালেও। তখন অবশ্য ইতিহাস চেহারা ধরেনি আজকের রূপে - রঙে - চিন্তনের অগ্রগামিতায় কিংবা ঝিদর্শণের ভৌগোলিক গণ্ডিবিহীন প্রসারতায়। সে-যুগের উপযোগী করে তখনকার দিনেরঅতীতচর্চা খঞ্জ পায়ে, আবছা দৃষ্টিতে। প্রাচীন কালের রাজারা সভাকবিদের দিয়ে লিখিয়ে নিতেন নিজেদের জীবনী, সেই সূত্রে স্ব-বংশের ইতিহাস। এইসব লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে যুদ্ধজয়ের অনুপুঙ্খ বিবরণ, কোথাও বা অতিরঞ্জিত বিচিত্র বীরত্বপূর্ণ জীবনের গল্প। বিজয়সূচক কীর্তিস্তম্ভস্থাপনও ছিল এই জাতীয় ইতিহাস - চর্চার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ,যা কিনা আজকের দিনে অতীতের ঘটনাবলীর সবচেয়ে বড় পাথুরে প্রমাণ। স্তাবকতার উচ্ছ্বসিত জোয়ারে স্বভাবতইপ্রকৃত তথ্য অবলুপ্ত হয়েছিল সেদিন ; আর তার স্থলে বাস্তব ও কল্পনা নির্বিরোধে মিল - মিশ খেয়ে তথ্য অবলুপ্ত হয়েছিল সেদিন ; উপন্যাসোপম নিটোল কাহিনী গড়ে তুলেছিল - যার প্রধান গুণ রম্যতা। অবশ্য এতটা ভাবা ভুল যে, প্রকৃত ঘটনার সব কিছু হারিয়ে গিয়েছিল কবিদের কাল্পনিকতায়। কাব্যিক উচ্ছ্বাসের রঙিন পর্দা সরিয়ে কিছু স্থুল তথ্য তো অবশ্যই মেলে কল্‌হনের ‘রাজতরঙ্গিনী’, বিল্‌হনের ‘বিক্রমাঙ্কদেবচরিত’, বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’ কিংবা সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিত’-এর মতো রচনায়। হিন্দুযুগের সীমানা টপকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যযুগে অর্থাৎ মুসলমান আমলে প্রবেশ করলে দেখা যায় রাজন্যবৃত্তের সংবাদ আরো গভীর ও বাস্তবানুগ হয়ে দেখা দিয়েছে এই সময়কার ঐতিহাসিকদের কলমে। পূর্ববর্তী হিন্দুরাজাদের তুলনায় তুর্কী, তাতার, পাঠান, মোগলদের মধ্যে অতীত সচেতনতা অনেক বেশি বলেই মনে হয়। তার প্রমাণ রয়ে গেছে চলমান সময়ের মধ্যপর্বে লেখা প্রথাসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে। বাবর, হুমায়ুনের মতো অনেক সম্রাট -সুলতান তো নিজেদের আত্মজীবনী লিখেছেনই, তার পাশাপাশি ভূয়োদর্শী পণ্ডিত ও অতীত সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ লেখককে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন তাঁদের রাজত্বকালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনেক খবর। অবশ্য এইসব সংবাদ একেবারে নির্জলা ছিল না। স্বভাবতই পৃষ্ঠপোষক নবাব - সুলতান কিংবাবাদশাকে বড় করে দেখানোর একটা মোসাহেবী মনোভাব কাজ করে গেছে এগুলির পিছনে। ক্ষমতাশালী প্রশাসকদের রাজকীয় জীবনের ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শনই এ শ্রেণীর রচনার লক্ষ্য। তাই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ, জয় - পরাজয়, হারেম-বিলাস ও স্বপ্নখোয়াবের কাহিনী। যে-সব লেখা পরিসংখ্যানমুলক, সেখান মেলে ভূমি - রাজস্ব ব্যবস্থা, মুদ্রানীতি, ব্যাঙ্কিং এবং শাসনতন্ত্রিক নানাদিকের ছবি। অন্য কোন বিকল্পের অভাবে আজকের কোন ঐতিহাসিক মধ্যযুগের কথা লিখতে গিয়ে অনিবার্যত নির্ভর করেন এই জাতীয় একপেশে রচনার উপর। ফল হয় মারাত্মক, সত্য ঘটনা ঢাকা পড়ে যায় মিথ্যার ধুসর কুয়াশায়।কিন্তু তবুও প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস গ্রন্থগুলিকে তুলনা করতে ইচ্ছে হয় বিশালায়তন জলমগ্ন হিমশৈলের সঙ্গে- যার খুব স্বল্প অংশই থাকে ওপরে দৃশ্যমান হয়ে, আর বৃহদংশ তলিয়ে থাকে অতল জলের গভীরে, বাইরে থেকে যার হদিশ মেলা ভার। এইসব ইতিহাসের স্বরূপ মোটামুটি তাই। যাঁকে ঘিরে গ্রন্থের পরিকল্পনা তাঁকে নিয়ে এগিয়ে চলে লেখকের লেখনী, আর তার বাইরে পড়ে - থাকা বৃহত্তর সমাজজীবনের আর সব দিক স্বভাবত থাকে অবহেলিত। অথচ একথা আজ দিনের

আলোর মতো স্পষ্ট যে, গ্রন্থিত রাজকাহিনীর বাইরে পরিমিত দূরত্ব থেকে চিরকাল বয়ে গিয়েছে সুবৃহৎ জনজীবনের উচ্ছ্বাসহীন অবিরাম কর্মপ্রবাহ, যার গ্রন্থনায় কেউ কোনদিন উৎসাহ দেখাননি। ইতিহাসের যথার্থ উপকরণ হয়ে ওঠার যোগ্যতাসম্পন্ন এই সজীব সত্তাটির যাবতীয় অভিক্ষেপ ধরা পড়েছে মানবপ্রকাশের ভিন্ন আর - এক ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রটাই হল সাহিত্য। ইতিহাস আর সাহিত্য তাই বাঁচে পারস্পরিক আদান -প্রদান, একে অন্যের হাত ধরে পেরিয়ে যায় অজানা অনেক অঞ্চল।

সাহিত্য আর ইতিহাসের এই অন্যোন্য - সম্বন্ধ তথ্যসন্ধানী গবেষককে মুগ্ধ করবেই। সমানভাবে ভাবিত করবে এ দু'য়ের পারস্পরিক আদান - প্রদানের ধরন নিয়ে। পুরনো দিনের অনেক তথ্যই তো আমাদের অজানা। অথচ সেকালের সাহিত্যের ভূর্জপত্রে ভূষাকালির অক্ষরে রয়ে গেছে অকথিত অনেক ইতিহাস, যাকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রত্ন - উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে আমাদের কোন দ্বিধা না রাখাই উচিত। উল্টোদিকে, ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া যায় কবির স্বকালের বাস্তবতা। কিন্তু তবুও কোথাও কোথাও থমকে যেতে হয় বিভ্রান্তির কারণে। ঐতিহাসিক যেমন পৃষ্ঠপোষক নবাব-সুলতানের নুন খেয়েছিলেন, তেমনি কিছু কবিও অন্নদাতা প্রভুর দাক্ষিণ্যে প্রতিপালিত। সেইসব কবিদের কলম অনেক ক্ষেত্রে সচল হয়েছে পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশে। ঠিক এরই সূত্র ধরে হঠাৎ উঠে পড়ে পোষ্টা-পোষিত সাহিত্যিক আর ঐতিহসিকের বিদ্ধে মিথ্যাকথনের অভিযোগ। অভিযোগের সত্যতাটা ধরাও পড়ে কখনো সখনো। নিমজ্জিত হিমশৈল তখন আর কেবল কল্পনানির্ভর ইতিহাসের উপমান হয়ে দেখা দেয় না, সমানভাবে লাগসই হয় ছন্দোবদ্ধ হয় কাব্যের ক্ষেত্রেও। এদের সম্পর্কেও সতেতন হওয়া প্রয়োজন, নইলে সত্য - সন্ধানের তরী যে- কোন সময়ে ফেঁসে যেতে পারে। এই ধরনের পৃষ্ঠপোষিত কাব্য বিষয়ে প্রখ্যাত সমালোচক ড. এল. এল. শুস্‌কিং - এর সাবধানবাণী সঠিক পথে চলার পক্ষে মূল্যবান পাথেয়। তিনি তাঁর বিখ্যাত রচনা "The Sociology of literary Taste'-এ রাজসভাশ্রিত কাব্যগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখেছেন "The history of literature is in large part the history of the beneficence of individual princes and aristocrats. In the middle Ages much of the principal art kept entirely within the general outlook of the bread – giver… The world is seen through the spectacles of the feudal lord." ১ এটা অবশ্যম্ভাবী, এটা নিয়তি, এটা অনিবার্য ভবিতব্য। রাষ্ট্রের প্রকৃতিই নির্ধারিণ করে দেয় সমাজে স্থিত কবি শিল্পী - বিজ্ঞানীর মতো প্রতিভাবানদের ভূমিকা ও অবস্থান। ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতিহীন মধ্যযুগে এদের মতো অসংখ্য কৃৎ - কুশলীর দল নিজেদের নিজত্বটুকু বিস্মৃত হয়ে আপন প্রতিভা উজাড় করে দিয়ে শাসকশ্রেণীর সুখ - সুবিধা, আরাম ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা পাকা করে তুলেছেন।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের প্রকৃতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এর কাঠামো অনেকটা পিরামিডের মতো শঙ্কু আকৃতির। সমাজ মূলত বিভক্ত - অভিজাত আর দরিদ্রে। ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ডের ভাষ্য গ্রহণ করে বলা যায়, উৎপাদক ও উপভোক্তা শ্রেণী, এরাই আজকের মার্ক্সীয় দর্শনের পরিভাষায় 'শোষিত' ও 'শোষক'. মধ্যবর্তী তৃতীয় কোন শ্রেণীর অস্তিত্বের স্বীকৃতি ছিল না সেদিন। যদিও আজকের মধ্যবিত্তের মতো সেকালেও একটা শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, যারা শাসিতের অন্তর্গত হয়েও রাজা ও রাজকর্মচারীদের বদান্যতায় রাজসভাগুলিতে জায়গা করে নিয়েছিল। আর সেই বদান্যতা লাভের অন্যতম কারণ তাদের বৃত্তিগত কুশলতা। ভোগ ও বিলাসিতায় অভ্যস্ত ধুরন্ধর প্রশাসকের দল এইসব বৃত্তিকুশল প্রতিভাবান মানুষদের দক্ষতাকে নিংড়ে নেবার র‍্যবস্থা করেছিল নানা কৌশলের ফাঁদ পেতে। এইভাবেই রাজসভায় ঠাঁই হয়েছে কবি - শিল্পী - নট - নটী - সংঙ্গীতকার- তক্ষণকার - স্থপতি-ভাট-সূত-ভাঁড়দের। এমন কি ব্যবহারিক জগতের প্রয়োজন মেটাতে ধোপা, নাপিত, ছুতোর, কামারেরাও পৃষ্ঠপোষিত হতো, আগেকার 'চাকরান'সম্পত্তিগুলিই তার প্রমাণ। অতএব এইসব বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত লোকেরা যে সামন্তপ্রভুদের ইচছানুযায়ী চলবে এটা ধরে নেওয়াই যায়। এ প্রথা অত্যন্ত প্রাচীন প্রথা। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে তো বটেই, পরবর্তী মুসলমান যুগেও এই রীতিঅল্পবিস্তর রূপান্তরসহ চলমান থেকেছে। রাজানুগ্রহ-প্রাপ্তদের সঙ্গে সাধারণ বৃত্তিজীবীদের কি ধরনের সম্পর্ক ছিল সেটা জানা না গেলেও অনুমান করা যায় অনুগৃহীতরা রাজন্যকুলের বদান্যতা কুড়োতে কমবেশি সচেষ্ট হতো। দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম অশেষ সৌভাগ্যবানরা অতঃপুর স্তাবকতা, মোসাহেবীয়ানা ও নিজস্ব দক্ষতা দিয়ে তুষ্ট করতে চাইতদণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের।

কর্তারাও বদান্যতা দেখাতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। ভূমি, বাসগৃহ, বস্ত্র - পরিচ্ছদ, মূল্যবান অলংকার, মোহর কিংবা চাঁদির সিক্কা দিয়ে অর্থবান অভিজাতরা একরকম কিনে নিত তাদের মেধাও শ্রমকে। আর এভাবেই কাল থেকে কালান্তরে বহমান থেকেছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে রাজা ও প্রজার পারস্পরিক বোঝাপড়া, দেনাপাওনার সম্পর্ক।

প্রাগাধুনিক যুগের মানুষ আরো একটা গোলকধাঁধায় ঘুরে মরেছিল - সেটা ধর্মের। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চলে আসা আদিন মানুষের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সংস্কার ও বিশ্বাস, আত্মশক্তিতে অনাস্থা এবং অতিলৌকিকের প্রতি তাদের চিরন্তন দুর্নিবার আগ্রহ ক্রমশ নিয়ে গিয়েছিল ধর্মের চৌহদ্দিতে। ধর্মকে ঘিরেই ঘটে সবদেশের মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির প্রাথমিক বিস্তার। অথচ ধর্ম তো কেবল বাহ্যিক আচার-আচরণের স্তূপ নয়, সে - এক অনুভবেদ্য মরমিয়া অনুভূতি। তবুও যুমন্তবুদ্ধির মানুষ অতি সহজে বাইরের চাকচিক্যে ভুলেছে, আর তাদের সুস্থ মস্তিষ্ককে ঘুলিয়ে তুলেছে শ্রেণী - স্বার্থন্বেষী মোল্লা - পুরোহিত- ধর্মযাজকের দল। এইজন্যই দলে - দলে, মতে - মতে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে ধর্মোন্মত্ততার। সব শ্রেণীর মাতলামিই তৈরি করে একটা ঘোর, একটা আচ্ছন্নতা. ইতিহাসের অনেকটা পথই অতিক্রম করে এসেছে মানুষ এই ধর্ম - ধোঁয়ার ঘোলাটে হয়ে থাকা দিনগুলোর মধ্য দিয়ে। শুধু শাস্ত্র - ব্যবসায়ীরাই নয়, কালে - কালে গজিয়ে ওঠা নানান বৃত্তিজীবীকেও লাগানো হয়েছে আফিম চড়ানোর কাজে। মধ্যযুগের ভাট, মাগধ, বৈতালিক, স্কপ (scop) এমনকি কবিরা দেবভাষায়, মাতৃভাষায় আকারে- ইঙ্গিতে যে - কথা সবাইকে বারবার বোঝাতে চেয়েছেন, সেটার সারাংশ হল রাজা ঈশ্বরের পার্থিব প্রতিনিধি। তাই দেবতার মতোতাঁর শক্তি, দেবতার মতো তিনি দয়াবান, দেবতার মতো তিনি অমোঘ ও দণ্ডদাতা। এই ঘোষণাই ধর্মভী শান্তিপ্রিয় প্রজাদের আড়ষ্ট ও নিশ্চেষ্ট করে তুলেছিল যে- কোন অন্যায়ের বিদ্ধে সংঘটিত রাজদ্রোহে। আর এই ভয়ত্রস্ততার পথে ভীদের সম্মান, শ্রদ্ধা আর অনুগত্য আদায় করে নিয়েছে অত্যাচার- পটু প্রশাসকের দল।

প্রাচীন আর মধ্যযুগের সাহিত্যের আশ্রয়ভূমি তো দুটো - ধর্মসমাজ আর রাজসভা। নিরক্ষর লোকসমাজে প্রচলিত ছিল সুবিপুল মৌখিক সাহিত্যের ধারা। এর পিছনও যথেষ্ট সমাজতাত্ত্বিক কারণ রয়েছে। এককালে যখন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলোর ছত্রছায়ায় সমাজের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শিক্ষালাভ করলো, তখন থেকে ধর্মের অনুশাসনগুলো লিখে রাখার প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। এই লিপিবদ্ধ অনুশাসনে ক্রমশ সঞ্চারিত হল শিল্পনৈপুণ্য -- যাআধ্যাত্মিক অনুভবকে লাগাতার ঠেলেছে সাহিত্যিক রসানুভবের দিকে। আর পরবর্তিকালে বিচিত্র কাহিনীর উদ্ভবে ধর্মের এই আবরণটা ক্রমশ দুর্ভেদ্য ও জৌলুসপূর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ ভেতরে ভেতরে রয়ে যায় সেই ধর্মভাবনার অন্তঃপ্রবাহী স্রোত। তারপরের ইতিহাস? খুব সংক্ষেপে অথচ অভ্রান্তভাবে বলেন একজন সাহিত্য - অভীক্ষক ‘‘যখন জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আকারে ধর্মমত প্রাচারের প্রয়োজন অনুভূত হয় তখনও সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সাহিত্যকে অবলম্বন স্বরূপ ব্যবহার করা হয় ; কারণ কেবলমাত্র সাহিত্যের মায়া - রসায়নই ধর্মের কঠিন ও নীরসতত্ত্বকে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারে। এইরকম করেই বিস্তৃত হয় সাহিত্যের পরিধি।’’২ আসলে সাধারণ মানুষের মনে জমে থাকা সরলমানের ধর্মবোধকে পুঁজি করে একদিকে যেমন পুরোহিত শ্রেণীর বংশানুক্রমিক বাণিজ্য চলেছিল, তেমনি সেই ধর্মের আঙিনায় সর্বপ্রথম চোখ মেলে মানবমনের কোমলতম প্রসূন কাব্যও। কিন্তু সেই নিরপরাধ নবজাতককে আধ্যাত্মিকতার হাতকড়া পরিয়ে হাজির করা হল গোষ্ঠীতন্ত্রের বধ্যভূমিতে। অনেক ধর্মের হাতে বিশুদ্ধ রসবাদী সাহিত্যের এই বলিদানের ক্ষণটিকে বলেছেন ‘পুণ্যলগ্ন’; ‘ধর্ম’ বলতেই সাধারণে বোঝে মঙ্গলময়তা।কিন্তু আজকের ব্যক্তিমুক্তির যুগে সাহিত্যের জীবনমুখী বিশ্লেষণে ধরা পড়ে সেদিনের মানুষের চিন্তার সীমাবদ্ধতা। বিজ্ঞানবুদ্ধির দৌলতে আজ প্রকৃতিকে যতটা কব্জা করেছে মানুষ, মধ্যযুগে নানান কারণে সেটা সম্ভব ছিল না। যুক্তিবাদেরও প্রকাশ ছিল খুবই ধীর, মন্থর। শাস্ত্রবচনে ভরসা রাখা মানুষগুলোর মধ্যে অদৃষ্টতত্ত্ব , জন্মান্তরবাদ, ভাগ্য, বিধিলিপি সংক্রান্ত ধারণা বেশ শিকড় গেড়ে বসেছিল। এর ওপরে প্রজাদের জান-মান-গর্দানের মালিক ছিলেন অমিত পেশীশক্তির প্রশাসকেরা। ফলে আত্মরক্ষার তাগিদেই মানুষ অনিবার্যভাবে মুখাপেক্ষী হয়েছে তথাকথিত ধনী অভিজাতদের। জীবনের অনিশ্চয়তা ঘোচাতে দূর-দুর

ান্তর থেকে এসে মানুষ ভীড় করেছে ধনীর প্রাসাদে। এই ইতিহাস হিন্দুযুগ থেকে মুসলমান যুগ পর্যন্ত অব্যাহত। রাজা কিংবা ভূস্বামীদের অনুগ্রহ প্রাপ্তির ইচ্ছা কম-বেশি সব শ্রমজীবীর মধ্যেই ছিল, যেমনটা আজকের পৃথিবীতে আমল াতন্ত্রের মধ্যে দেখা যায়। এতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিকিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। অন্নদাতা প্রভুর মনোরঞ্জন করতে গিয়ে প্রভূত কবিত্বশক্তির অধিকারী বাণীর বরপুত্র রায়গুণাকর ভরতচন্দ্রও যে 'নটবিটে'র দলভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন সেকথা স্পষ্টাকারে জানিয়েছেন কাব্যরসিক বীরবল। কবিও বোধহয় সচেতন ছিলেন আপন ভূমিকা বিষয়ে, নইলে অলঙ্কৃত ক্ষোভ কেন বাজবে তাঁর লেখনীতে 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার'। আশ্চর্য লাগে একথাও ভ াবতে যে, মাইকেলের মতো আধুনিকভাবচেতনায় উদ্দীপ্ত ভাগ্যবিপর্যস্ত কবিও সারা জীবন সাহিত্যসাধনা করেছেন বদ ান্য জমিদারদের ছত্রছায়ায় বসে; এমনকি শেষ বয়সে অসুস্থতার মধ্যেও পুলিয়ার পঞ্চকোটের রাজার ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করে ভাগ্য পরিবর্তনের অন্তিম চেষ্টাও করেছিলেন। তাঁর জীবনীকারের মতে, সেটাও ছিল নাকি বিত্তবান পেট্রন দ্বারা অনুগৃহীত হওয়ারপোষাকী প্রচেষ্টা ! এটা খুবই ঠিক যে, সেকালের রাজা- ভূস্বামীদের প্রসাদ কুড়িয়েই অনেক কবি-শিল্পী বেঁচে - বর্তেথেকে তাঁদের অমর সৃষ্টিকে আজকের স্বাধীন পাঠক - শ্রোতার যুগে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা যাঁদের আশু মনোরঞ্জনের জন্য আপন প্রতিভাশক্তি ক্ষয় করেছেন সেইসব অন্নদাতা প্রভুদের অনেকেই ছিলেন ভারতচনদ্র - কথিত 'ভেড়া'। কাব্য - সংগীত - নৃত্য তাঁদের কাছে স্রেফ বিলাসিতার উপকরণ ছিল - এগুলির ভিন্নতর মূল্য তাঁরা স্বীকার করতেন কি না সন্দেহ। কবি - শিল্পের জীবনের দুর্লভ সত্যবোধ দৈবাৎ তাঁদের সৃষ্টিতে লগ্ন হয়ে থাকলেও যে - কোন কারণেই হোক তা অবহেলিত হয়েছে। আরস্রষ্টারাও বুঝে গিয়েছিলেন, অনুগ্রহ প্রাপ্তির স্রোত অব্যাহত রাখতে গেলে পোষ্টার মর্জি ও চির সঙ্গে সমঝোতা সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এ এক অদ্ভুত দাস - মনোবৃত্তি, যার চালিকা শক্তি ছিল জীবনে নিরাপত্তালাভের দুর্নিবার আকাঙক্ষা। সেকালের বাঙালি কবিদের জীবনেতিহাস এর উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, বিপ্রদাস পিপলাই কিংবা রামের ভট্টাচার্যর মতো শক্তিম ান কবিদের কলম তখনই সচল হলো, যখন তাঁরা আশ্রয় পেলেন ধনশালী রাজা কিংবা ভূস্বামীর, অথবা জীবনের স্থায়ী নিরাপত্তা লাভ করলেন মাস-মাইনের চাকরিতে। এ হেন পরিস্থিতিতে কবিদের কলমে প্রভুস্তবের বাড়াবাড়ি ঘটতেই প ারে। কেননা তাঁরা অনুভব করেছিলে, পরলোকের দেবতা আর পার্থিব - দেবতার ভূমিকাগত সাদৃশ্য। এই দুই শ্রেণীর ইষ্টই তুষ্ট হলে যে জীবন সুখ - শান্তি - মঙ্গল - কল্যাণপূর্ণ হয়ে ওঠে সে বিশ্বাস তাঁদের গড়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত এটা যে দৈবাদেশ আর রাজাদেশের মধ্যে দ্বিতীয়টিকে কখনো কখনো শ্রেয়তর বলেও মনে হয়েছে। যেমনটা ঘটেছে কবিকঙ্কণের ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক কারণে উপদ্রুত কবি প্রাণভয়ে পালানোর সময় ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে স্বপ্নে পেলেন কাব্যরচনার দৈবীনির্দেশ ; কিন্তু কবি কাবসৃষ্টির প্রকৃত তাগিদ পেলেন তখনই যখন তাঁর পুত্রতুল্য ছাত্র নরপতি রঘুনাথ 'অনুমতি' জ ানালেন। কাব্যশ্রবণে তৃপ্ত রাজা গায়েনকে দিলেন ভূষণ ; অনুল্লেখিত হলেও অনুগৃহীতের তালিকা থেকে কবিও বাদ য াননি নিশ্চয়ই। এটা কোন বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত নয়, কবিকঙ্কণের মতো আরো অনেক কবিকেইজানি আমরা যাঁরা রাজা কিংবা বিত্তশালী রাজকর্মচারীদের দ্বারা ধন-দৌলত, ভূমি - শস্যে পৃষ্টপোষিত হয়েছেন, বিনিময়ে তাঁরা কাব্য শুনিয়ে তৃপ্ত করেছেন রাজা ও তাঁর পার্ষদদের, অবসর মতো স্তাবকতায় মুগ্ধ করেছেন সংশিষ্ট সকলকেই।

এইভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধূসর আস্তরণে ঢাকা ইতিহাসের পাতাগুলোর নবতর পাঠ অনুশীলন করলে রাজ াদেরকবি - পোষণ ও কবিদের রাজ - তোষণের অনেক রূপ - রহস্যই জানতে পারা যাবে। স্পষ্ট করে কোথাও লেখা ন া থাকলেও বোঝা যায় দু'পক্ষই মিথোজীবিতার কৌশলে দেওয়া - নেওয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল, ঠিক যেমনট াঘটে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক যোগসাজসে। এই দুই সামাজিক শ্রেণীর আঁতাত অত্যন্ত স্পষ্ট চেহারা নিয়েছে মহাভারতের শান্তিপর্বের এই শ্লোকটিতে

"ব্রহ্ম বর্ধয়তি ক্ষত্রং ক্ষত্রতো ব্রহ্ম বর্ধতে।
রাজা সর্বস্য চান্যস্য স্বামী রাজ্ঞঃ পুরোহিত।।" (৭৩ /৭০)

কবি আর কবির পৃষ্টপোষকের হয়তো ঠিক এতটাই লিখিত চুক্তিপত্র মেলেনি, কিন্তু অনুমান করতে দোষের নেই যে, এই ধরনের বোঝাপড়ায় মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা নির্ভেজাল রাজন্যস্তুতিতে তাঁদের কাব্যগুলি ভারাক্রান্ত করে

তুলেছিলেন। কিন্তু এ দোষ তো কেবল বাঙালী কবির নয় ; তাঁদের সারস্বত পূর্বপুষ যাঁরা, একদা যাঁদের বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত দেবভাষার কাব্য রাজন্যবর্গের প্রীতি উৎপাদন করেছিল, তাঁদের লেখাতেই সূচনা হয়েছিল এ রীতির। প্রাবন্ধিকবিনয় ঘোষ তাঁর 'জনসভার সাহিত্য' গ্রন্থে বেশ তথ্য সহকাবেই তুলে ধরেন সংস্কৃত কাব্য-ব্যবসায়ীদের সেই নির্লজ্জ পোষ্টাস্তুতিকে। না, এ দোষ কেবল ভারতবর্ষের চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এ প্রথা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই গড়ে উঠেছিল। এরই প্রমাণ ইওরোপের টিউটনযুগের 'স্কপ' ও 'ফাইল'রা, লর্ড-ব্যারন-নাইট শোভিত রাজসভায় প্রশস্তি-গায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। টিউটনিক 'স্কপ'রা তো ভিন্নপ্রকারে আজও বেঁচে আছেন লরিয়েট কবিদের মধ্যে। এঁরা গুণগ্রাহী রাজাদের কাছ থেকে পেতেন বৃত্তি, সম্মান, পদমর্যাদা। এঁরা অনুগত ও বিশ্বস্ত ছিলেন। রাজা আগামেমনন নাকি একবার তাঁর রাণীকে রেখে গিয়েছিলেন একজন সভাগায়কের অভিভাবকত্বে। ভারতবর্ষে 'স্কপ'- দের জায়গাটা পুরণ করেছিলেন সূত্র ও মাগধরা। তবে পদর্যাদায় 'স্কপ'দের তুলনায় একটু নীচে ছিলেন এঁরা। এন. কে. সিদ্ধান্ত তাঁর 'The Heroic Age of India' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে পেশাদার স্তাবক ও ক্লাউনদের মতো ভূমিকা পালন করতেন ভারতীয় সূতরা। (৩) রাজাদের বীরত্বসূচক কাহিনী মুখে মুখে গাইতে হতো এঁদের। সূতদের মধ্যেও ছিল বর্ণগত বিভাজন - ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ গোত্রীয় সূত দানধ্যানেরফিরিস্তি দিয়ে দাতার মহিমা কীর্তন করবেন, আর ক্ষত্রিয় সূত বীরগাথা গেয়ে করবেন বীরের গুণগান। এ প্রথা বেদ ও উপনিষদের যুগে চললেও মহাভারতের যুগে পেশাদার স্তুতিগায়কের শ্রেণী গড়ে ওঠে। ঐ মহাকাব্যেই সূতদের জাতি-পরিচয় জ্ঞাপন করতে গিয়ে জানানো হয়েছে ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয় সন্তানই হতেন সূত, আর তার পেশা হবে রাজা-রাজড়া ও মহাপুষদের গুণকীর্তন করা। এবং মাগধ বলে কথিত হতো তারাই যাদের সৃষ্টি বৈশ্য পিতা ও ক্ষত্রিয়া মাতার মিলনে। এদের কাজ ছিল উচচকণ্ঠে স্তুতিগান গাওয়া। সূত ও মাগধরা যখন এমনি ভাবে আলাদা দুই জন্মভিত্তিক জাতিতে পরিণত হল, তখন সকলের পক্ষে রাজসভায় স্থান করে নেওয়া সম্ভব হল না। তাই মাঠে -ঘাটে - মেলায়, লোকসমাজের নানা পার্বণে রাজসভা বহির্ভূতরা নিতান্ত পেটের দায়ে গান গাইলেও সে - গানে নানা ভাবনার পাশাপাশি রীতিমতো স্থান পেতো রাজ - প্রশংসা, আর সে বোধহয় প্রশাসকদের অনুকম্পা- দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। এইভাবে সামন্তযুগে ফিউডাল লর্ড আর অ্যারিস্টোক্র্যাটদের পায়ের তলার জুতো হয়ে থাকতে হয়েছে বর্তমানকালের 'কবি' নামক স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট শ্রেণীর সাংস্কৃতিক পূর্বপুষদের। এই দাসত্ববন্ধন থেকে তাঁদের পূর্ণমুক্তি মিললো স্বাধীন পাঠকের যুগে।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রাজন্যস্তুতি নিয়ে আলোচনার আগে বঙ্গদেশে রচিত কয়েকটি সংস্কৃত রচনার দিকে একঝলক তাকিয়ে নেওয়া যাক। এইসব রচনার স্থানবিশেষে পোষ্টাপ্রভুর নির্ভেজাল গুণকীর্তন করা হয়েছে। যে-সব গুণের গরিমা কবিদের কলম থেকে বেরিয়েছে, তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস তার বিরোধিতা করে। কবিরা অবশ্য ইতিহাসের সত্যতাকে তেমন গুত্ব দিতেন না, বরং তাঁরা সর্বাংশে চালিত হতেন মোসাহেবী বুদ্ধি ও তদুযোগী কৌশলের দ্বারা। প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠার দুরন্ত প্রতিযোগিতায় স্বচ্ছ দৃষ্টি আচ্ছন্ন হওয়ায় দেবতা আর রাজায় কোন পার্থক্য দেখতেন না সামন্তযুগের কবিরা। দেবতা আর রাজার সাদৃশ্য ধরা পড়েছিল কতকগুলি বাহ্যিক লক্ষণে, যেগুলির মধ্যে অন্যতম --শক্তিমত্তা, চাকচিক্যময় সাজসজ্জা ও কৃপাবর্ষণে মুক্তহস্ততা। তাই দেখা যায়, পাল বংশের অন্যতম নরপতি রামপাল কৈবর্ত-শক্তির হাত থেকে বরেন্দ্র উদ্ধার করার পর নিজের কীর্তিকে অক্ষয় করে রাখবার জন্যে যে-কাব্য লেখালেন সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে দিয়ে, সে-কাব্যে চাতুময় শ্লেষ ব্যবহার করে কৌশলী কবি পুরাণ-খ্যাত ইক্ষবাকু বংশীয় রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে একাসনে অন্নদাতা প্রভুকে বসিয়ে তাঁর অন্নঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেছেন। স্তাবকতার চূড়ান্ত করে ছাড়া হয়েছে এইসব শ্লোকগুলিতে---

"যোয়ং গদিতো নাগস্কন্ধক্ষিতিভৃন্ময়া বিদিতগোসারঃ।
পরমবিলাসিনমেনং হরিমিব হরিকেতনং কথমিব স্তৌমি।।"৪

অথচ ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই চোখে পড়বে কৈবর্তরাজ দিব্যোককে পরাস্ত করা এত সহজে সম্ভব হয়নি 'নাগস্কন্ধ' হরিতুল্য নৃপতির পক্ষে। বরং পরাক্রমশালী কৈবর্তরাজ একাধিকার রামপালের রাজ্য আক্রমন করেছিলেন। দিব্যোকের

পর দোক ও তাঁর ভাই ভীম বরেন্দ্রীর অধিপতি হলে কৈবর্তশক্তি আরো অপরাজেয় হয়ে ওঠে। এর পরের ইতিহাস শোনা যাক ড. নীহাররঞ্জন রায়ের কলম থেকে "রামপাল শঙ্কিত হইয়া প্রতিবেশী রাজাদের ও পালরাষ্ট্রের অতীত ও বর্তমান, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দুয়ারে দুয়ারে তাঁহাদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিলেন। অপরিমিত ভূমি ও অজস্র অর্থ দান করিয়া এই সাহায্য ক্রয় করিতে হইল। ...এই সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে ক্ষৌণী-নায়ক ভীমের পক্ষে আঁটিয়া ওঠা সম্ভব ছিল না। ভীম বন্দী হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভীমের অন্যতম সুহৃদ ও সহায়ক পরি পরাজিত ও পর্যুদস্ত কৈবর্ত সৈন্যদের একত্র করিয়া আবার যুদ্ধে রামপালের পুত্রের সম্মুখীন হন, কিন্তু অজস্র অর্থদানে কৈবর্তসেনা ও হরিকে বশীভূত করা হয়।"৫ এই তাহলে বীরত্বের নমুনা ! কবির কাব্যকল্পনাও বলিহারি। উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করে যে মদনপাল কাপুষতা ও অনৈতিকতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, সেই রাজপুত্র কাব্যে অভিবন্দিত হলেন শুদ্ধ, মনোজ্ঞ, পণ্ডিত ও বাগ্‌বিশারদ রূপে। প্রশ্ন জাগে, সত্যভাষণের কি আদৌ কোনদায়বদ্ধতা ছিল না সেকালের কবিদের? এর সম্ভাব্য উত্তর নেতিবাচক বলেই মনে হয়। নইলে সে- রাজত্বের শেষদিকে রাজসভায় যখন বিলাসিতার হিল্লোল বয়ে যাচ্ছিল, বাহুবল স্তিমিত হয়ে পড়ছিল, দেশের সৈনাপত্য গ্রহণ করেছিলেন জ্যোতিষী আর দৈবজ্ঞের দল, তখন জয়দেবের মতো কবি কেমন করে লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে লেখেন 'সঙ্গরকলাগাঙ্গেয়', অর্থাৎ (রাজা) যুদ্ধবিদ্যায় ভীষ্ম? কবির এ স্তুতির পক্ষে দাঁড়ানোর মতো কোন রাজকীয় খবর নেই। বরং এ তথ্য সর্বত্র লভ্য যে, সেন বংশের শেষ নৃপতি ছিলেন কেলিকলার নায়ক। আদিরসে আপাদমস্তক নিমজ্জিত ছিলেন তিনি ; আর এই রসের প্রবাহ অফুরান করার উদ্দেশ্যে তাঁর পোষ্য 'পঞ্চরত্ন' দিবারাত্র রভসীলালার কাব্যচর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। ধর্মের আবরণ সরিয়ে ধোয়ী তো রাজাকেই তাঁর রচনার ললিত নায়ক করে ফেঁদে বসলেন একটি দূতকাব্য, যেখানে কল্পিতা নায়িকা কুবলয়বতীর সঙ্গে রাজার রোমান্টিক প্রেমের গুপ্ত আদান-প্রদান চলেছে। শৃঙ্গার রসাত্মক মুখরোচক এ গল্প নিশ্চয়ই রাজা ও তাঁর সভাসদদের আমোদিত করেছিল। আর আনন্দিত রাজা পুরস্কার স্বরূপ শুধু 'কবিক্ষনাপতি' উপাধি দান করেই ক্ষান্ত হননি, স্বর্ণাভরণ-মণ্ডিত হস্তিব্যূহ ও হেমদণ্ডযুক্ত দুই চামর কবির হাতে তুলে দিয়ে তাঁর বদান্যতার পরিচয় রেখেছিলেন - সে খবরটাও জানা যাচ্ছে কবির কাব্যসমাপ্তির স্বীকারোক্তি থেকে। প্রায় একই রকম দানের নজির ছিল রাজা চানক্যচন্দ্রেরও। তথ্যটা মিলছে উমাপতিধরের চন্দ্রচূড়চরিত কাব্য থেকে। সাহিত্যরসিক নৃপতি প্রসন্ন হয়ে আনুগত্য আদায়ের জন্য কবিকে দিয়েছিলেন প্রভূত রত্নালঙ্কার, বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং একশটি গ্রাম। এই একই দেওয়া - নেওয়া রীতি সচল থেকেছে পাঠান যুগেও। প্রশাসকরা বিধর্মী হলেও হিন্দুযুগের সামন্ততান্ত্রিক প্রথার সব কিছু মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল। হিন্দু রাজাদের সভাগৃহ থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া পণ্ডিত ও কবিকুল পৃষ্ঠপোষিত হতে থাকেন পাঠান - সুলতানদের রাজদরবার গুলিতে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন মথুরেশ। সুলেমান খানের পৌত্র মুসা খান মসনদ আলির দরবারে বসে 'শব্দরত্নাবলী' নামে একটি অভিধানের বই লিখেছিলেন। সেই বইয়ের সূচনায় ও প্রান্তভাগে যে-ভাষায় পেট্রন বন্দনা করেন তাতে স্পষ্ট হয়েওঠে পণ্ডিতজীর মোসাহেবী মনোভাব। শত্রুপীড়ক সুলতানের কীর্তি বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন

"যল্লক্ষনীর্বর বৈরিণাং কুলবধুসিন্দুর বিধবংসিনী
যদ্বানী ললিতা সতাং গুণবতামানন্দ কল্লোলিনী।
যদ্বক্ষোত্তরকল্পনা বিজয়িনী কর্ণাদিপৃথ্বীভূজাং
সোহায়ং শ্রীমশনন্দ এল্লিনৃপতিজীয়াচ চিরং ভূতলে।।"৬

প্রভু-বন্দনার তালিকা থেকে বাদ যান না মুসার দুই অনুজ মহম্মদ ও আবদুল্লা খান। প্রতাপে মহম্মদ মার্তণ্ডের মতো প্রচণ্ড, শত্রুকুলের যম; আর আবদুল্লা 'বীরেন্দ্র চূড়ামণি', 'কাম-সহোদর' এবং 'অতি রসিক'।

পোষ্টা-বন্দনার এই নির্লজ্জ ধরনটার অনেকটাই রপ্ত করে নেন মধ্যযুগের বাঙালি কবিকুল। কি মঙ্গলকাব্যে, কি অনুবাদ সাহিত্যে, কিংবা রোমান্টিক প্রণয় - আখ্যানে কবিদের স্তাবকতার স্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছে। যাঁরা রাজসভায় পৃষ্ঠপোষিত হয়েছেন তাঁদের লেখাতে তো বটেই, যাঁরা স্বাধীনভাবে কাব্যরচনা করেছেন তাঁরাও সমকালের রাজা, ভূস্বামী, নবাব, বাদশাহদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। এর পিছনে কোন্ মনোবৃত্তি সক্রিয় ছিল তা হয়তো স্পষ্ট করে বলা

সম্ভব নয়, তবে যে শুধুমাত্র ইতিহাস-বিবৃতির দায় থেকেই রাজপ্রশস্তি করা হয়নি - এটা নানাসূত্রে বোঝা যায়। যদিও এসব উল্লেখেরও ভিন্নতর ঐতিহাসিক মূল্য আজ গবেষকদের কাছে স্বীকৃতি পাচ্ছে --বিশেষত কবির কালনির্ণয়ে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, কবিদের রাজপ্রশস্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপমাধর্মী। আর উপমানের জগতে বিচরণ করেছেন প্রচণ্ড তেজোময় সূর্য, দানবীর কর্ণ, ধনুর্ধর অর্জুন, প্রজানুরঞ্জক রামচন্দ্র, দেবরাজ ইন্দ্র, জ্ঞানবৃদ্ধ গু বৃহস্পতি প্রমুখ পৌরাণিক চরিত্র সমূহ। প্রশস্তির তালিকা থেকে বাদ যান না পৃষ্ঠপোষক কিংবা প্রশাসকদের পূর্বপুষরা। প্রশাসনের সর্বোচ্চ চূড়ায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা তো বটেই, তাছাড়াও পোষ্টা - বন্দনার আওতাভুক্ত হয়েছেন অসংখ্য উচচপদস্থ রাজকর্মচারী, আমীর, ওমরাহ, উজির, সেনাপতি কিংবা ঐ বর্গেরই মানুষ জন। সবক্ষেত্রেই কবিদের কলম অসম্ভব বল্‌গাহীন। পৃষ্ঠপোষকদের ধর্মনিষ্ঠা, বদান্যতা, দানশীলতা, শাস্ত্রজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি প্রশংসিত হয়েছে। সত্যের খাতিরে একথা বলতেই হবে, কোন কোন সুলতান কিংবা পদস্থ কর্মচারী সত্যই গুণশালী ছিলেন, ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী। কিন্তু বেশ কয়েকজন শাসনকর্তাকে কবিদের স্তুতির তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে যাঁদের সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা শংসাপত্র দিতে পারেননি। অথচ এটা তো সর্বজনবিদিত যে, সুলতানদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা তাঁদের প্রশাসনিক ভূমিকাটিকে উজ্জ্বল করে তুললেও সেটা সাংস্কৃতিক সম্পন্নতার কোন প্রমাণ-চিহ্ বহনকরে না। তবে একটা বিষয়ে বিদ্যোৎসাহী মুসলমান শাসকরা সত্যই অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। সেটি দেশীয় ভাষাবাংলার প্রতি অনুরক্তিতে ও সে-ভাষায় কাব্যরচনার সানন্দ পৃষ্ঠপোষণায়। যদিও এসবের পিছনে শাসকদের কোন বিশিষ্ট মনোবৃত্তি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল বলে মনে হয়। বাঙালী হিন্দু প্রজাসাধারণের কাছের মানুষ হয়ে ওঠবার রাজনৈতিক তাগিদ থেকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নবাব-সুলতানদের এ হেন অবস্থান নিঃসন্দেহে সেদিনের পক্ষে খুবই গুত্বপূর্ণ ছিল। যুগের নিজস্ব প্রয়োজনে বাংলা তো প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে ত্রমশ গড়ে উঠছিলই, সেই ঘটনাকে আরো দ্রুত করে তুললো শাসকদের পৃষ্ঠপোষণা। আসলে পুরনো হিন্দু সামন্ততন্ত্র সরে গেলেও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পুরো খোল-নলচে বদলে দেবার ইচ্ছে ছিল না নবাগত প্রশাসকদের। ফলত অভিজাতদের মনোরঞ্জনের জন্য পূর্বের কবি, নর্তক, গায়ক, ভাট, শিল্পী, ভাস্কররা পুনরায় বহাল হলেন। এমনকি অধিকাংশ মুসলমান রাজ-দরবারে ইসলাম - ধর্মাবলম্বী যোগ্য লোকের অভাবে পাত্র-মিত্র-সভাসদ হিসেবে বসলেন শাস্ত্রজ্ঞান ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুরাই। এক্ষেত্রে ব্যতিত্রমী উদাহরণ হিসেবে হয়তো কেবল কনুদ্দিন বারবক শাহের দরবারের কথা উল্লেখ করা যায়। এই ছবিটা বোধহয় পরিবর্তিত হতে থাকে হুসেনশাহী আমলের পর থেকে। পরিবর্তনটা ব্যাপকভাবে চোখেপড়ে মুঘল আমলে। এই সময়টা ইরানীয় সংস্কৃতির ত্রমপ্রসারে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে ত্রমশ কবিপ্রতিভা-সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব ঘটে। ষোড়শ শতকে বিচ্ছিন্ন কয়েকজনের পর সপ্তদশ শতকে এক ঝাঁক উজ্জ্বল মুসলিম কবি তাঁদের সৃষ্টিশীল লেখনীর উদ্ভাবনীশক্তিতে বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়ে গেলেন। এঁরাও গতানুগতিক প্রথায় পোষ্টাস্তুতি করেছেন, জানিয়েছেন অন্নদাতা প্রভুদের প্রতি বিনম্র প্রণতি। রোসাঙ রাজসভার কবি দৌলত কাজি তো তাঁর 'লোরচন্দ্রাণী'তে আলাদা করে একটি অধ্যায়ই লেখেন, সম্পাদকেরা যাকে চিহিত করেছেন 'রোসাঙ রাজস্তুতি' শিরোনামে।

অবশেষে প্রবেশ করা যাক কবিদের প্রশস্তি বচনের কেয়ারী- করা সাজানো - কথার ফুলবাগানে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' - কার বড়ু চণ্ডীদাস মধ্যযুগের প্রারম্ভিক ও ত্রান্তিকারী কবি হলেও রামায়ণ অনুবাদক কৃত্তিবাসই প্রথম কবি যাঁর রচনা অটুট অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তাঁর আত্মবিবরণের অংশটুকুতে জয়গোপালী - হস্তকুশলতার অভিযোগ কিয়দংশে মেনে নিয়েও বলা যাবে, তিনি কোন - এক গৌড়রাজের সভায় উপনীত হয়ে শ্লোক শুনিয়ে খুশি করেছিলেন রাজাকে। সন্তুষ্টচিত্ত রাজা তাঁকে অনেক কিছু দিতে চাইলেও তিনি কবিজনোচিত যশ প্রার্থনা করলেন। কেননা গুণীর গুণের স্বীকৃতিদান তখনো স্বাধীন পাঠক তথা সাধারণ লোকের এত্তিয়ার - বহির্ভূত। কৃত্তিবাস দেশকালের রীতিনীতিজানতেন বলেই তো লিখেছেন, 'গৌড়ের পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা'। কবির গুণমুগ্ধ রাজার অনুমতিত্রমেই বোধহয় কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালি' লিখিত হয়েছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, কৃত্তিবাসের অনুল্লেখের কারণে একটি বিশিষ্ট বাংলা গ্রন্থের কাব্যরসপ্রিয় উৎসাহদাতার নামটাই জানা হল না রসিক বাঙালীর।

পঞ্চদশ শতকের চতুর্থ পাদে বেশ কয়েকজন কবিকে পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা সুলতান হুসেন শাহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাংলার মসনদে আলাউদ্দিন সেরিফ মেক্কা হুসেন খুব সম্ভবত ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে আরোহন করেন। 'পদ্মাপুরান' -এর কবি বিজয় গুপ্ত, মহাভারতের অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী, মনসামঙ্গলের বিপ্রদাস পিপলাই নবাবহুসেনের গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষ হুসেনের পিতৃভূমি নয় ; কিন্তু একজন ভাগ্যান্বেষী হিসেবে তিনি বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে অধ্যবসায় ও দূরদৃষ্টির বলে প্রথমে উজির ও পরে সুলতান হয়ে নিজ প্রতিভা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সামসুদ্দিন মুজফ্ফরের নেতৃত্বে যে-দুঃশাসনীয় হাবসী শাসন কায়েম হয়েছিল বাংলায় তিনি তার অবসান ঘটান। ফলে বাঙালী হিন্দু প্রজাসাধারণের কাছে খ্যাতি পেতে তাঁর দেরী হয়নি। সুদূর বরিশালেও যে শাহ হুসেনের সুশাসনের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল, সে অঞ্চলের গৈলা-ফুল্লশ্রীর কবি বিজয় গুপ্তের সাক্ষ্য প্রমান এখন উদ্ধার করা যেতে পারে

সুলতান হোসেন সাহা নৃপতি তিলক।।
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী।।
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।৭

বিপ্রদাসের কাব্য খুব সম্ভবত লেখা হয়েছিল ১৪৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। হুসেন ততদিনে রাজ্যের অধিকার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন, গৌড়ে তাঁর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। এরই সার্থক উল্লেখ পাই তাঁর রচনায়। দু' এক বৎসরের মধ্যে (আনুমানিক ১৪৯৭-৯৮ খ্রী.) শঙ্কর কিঙ্কর মিশ্র হাত দিলেন 'গৌরীমঙ্গল'-এ। এই মহাভুজ প্রচণ্ড বলশালী সুলতান সম্পর্কে তাঁর অনুভব?

পৃথিবীর সার রাজ্যে পঞ্চগৌড় নাম।
নৃপতি হুষেণ সাহা কলিযুগে রাম।।
খাণ্ডাএ প্রচণ্ড রাজা প্রতাপে তপন।
জার ভয়ে কম্পিত সকল নৃপগণ।।৮

হুসেনের অধীনস্থ সেনাপতি লস্কর পরাগল খান চট্টগ্রাম আক্রমণ করে জয়ী হয়ে সুলতানের নির্দেশে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইনি একজন কলারসিক ও বিদ্যোৎসাহী। রাজ্যশাসনের পাশাপাশি ইনি কাব্যবোধেরও পরিচয়রেখেছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে মহাভারত অনুবাদের নির্দেশ দিয়ে। পৃষ্ঠপোষকের রসপিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য তাঁরাই খেয়াল মতো একদিনের সময় সীমায় ভারত - পাঁচালি বাঁধা পড়লো পরমেশ্বরের হাতে। কবির পারঙ্গমতায় মুগ্ধ পরাগল 'কবীন্দ্র' উপাধি দানে কবিকে কৃতার্থ ও পুরস্কৃত করলেন। আর কবীন্দ্রের অনুবাদও পোষ্টা সুলতানের নামে 'পরাগলী মহাভারত' বলে খ্যাত হল বিদগ্ধ সমাজে। শোনা যায়, পরাগলের পুত্র নসরৎ বা ছুটি খানও (মতান্তরে নসরৎ হোসেনের পুত্র) পিতার মতো বীর, যুদ্ধপ্রিয় ও কাব্যরসিক ছিলেন। বীরত্বের কাহিনী শুনতে চেয়ে সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে নির্দেশ দেন কাব্যরচনার। শ্রীকর অন্নদাতা প্রভুর মনোভাব বুঝে ব্যাসদেবের মূল মহাভারত ছেড়ে জৈমিনী-ভারত অবলম্বনে অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনীটুকুই তুলে ধরলেন। কবির কীর্তি আত্মসাৎ করে সে-কাব্যও একদা পাঠক সমাজে পরিচিতি লাভ করলো পৃষ্ঠপোষক ছুটি খানের নামে।

পঞ্চদশ শতকের আর একজন কবির উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ। ইনি বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের প্রথম রূপকার শাহ মুহম্মদ সকীর। কবি বোধহয় সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের সমসাময়িক। সগীর তাঁর 'ইউসুফ - জোলেখা' কাব্যে আজম শাহের যে - প্রশংসা করেছেন তা বিনয় বচনে ও অতিরঞ্জনে সত্যই চমকপ্রদ। প্রথমে আল্লাহ্ ও দ্বিতীয়ে রসুল বন্দনার পর--

তৃতীয় প্রণাম করোঁ রাজ্যক ঈশ্বর।
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর।।

রাজ - রাজ্যের মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নৃপ জগৎ বিদিত।।
মানুষ্যের মধ্যে জেহ ধর্ম অবতার।
মহা নরপতি গ্যেছ পৃথিবীর সার।।
কণা হৃদয় রাজা পুণ্যবন্ত ওর।
পূর্নিমার চান্দ জনি বদন সুন্দর।।৯

ইসলাম ধর্ম নিয়ে প্রথম কাব্য রচনা করেন সিদ্দিকি বংশের কবি জৈনুদ্দিন। তিনি তাঁর 'রসুল বিজয়'-এ কোন - এক'ইছুপ খান' - কে বিপুলভাবে স্তুতি জানিয়েছেন। অধিকাংশ গবেষকের ধারণা, ইনি কনুদ্দিন বারবক শাহের পুত্র, যিনি সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ নামে ১৪৭৪-৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়বঙ্গ শাসন করেছিলেন। ইতিহাসের তথ্যসূত্রেই বলা যায়, ইউসুফ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেও কখনই তাঁর পিতার মতো বিদ্বান, গুণবান ও কাব্যানুর াগীছিলেন না। তবুও বারবকের সভায় জায়গা পাওয়া কবি অন্নদাতার মনোরঞ্জনের জন্য লিখতে বাধ্য হয়েছেন

দানে ধর্ম হরিশচন্দ্র মান্য গু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুত ইছুপ খান আরতি কারণ জান
বিরচিলুঁ পাঞ্চালি সন্ধান।।
ভাবে ভব কল্পত জানে শুত্র জ্ঞানে গু
ধ্যানে হয় মহেশ সমান।১০

প্রায় দু'শো বছরের স্বাধীন সুলতানদের আমল শেষ হয়ে গিয়ে বিহারের সাসারামের জায়গীরদার শের শাহ ও তাঁর বংশধরদের রাজত্বকাল পেরিয়ে গৌড়বঙ্গ আবার চলে আসে সরাসরি দিল্লীর নিয়ন্ত্রণে। ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর শ াহেন-শা আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ করবানি বংশের শেষ সুলতান দাউদ খাঁর হাত থেকে বাংলার অধিকার ছিনিয়ে নিলে বাঙালী জনসাধারণ মুঘল সম্রাটদের অধীনস্থ প্রজায় পরিণত হয়। ষোড়শ শতকের সূচনাভাগ থেকে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের সারাদেশব্যাপী আন্দোলন বাঙালীর ভাবগত কূপমণ্ডূকতা কাটিয়ে যেমন ত াকে অন্য প্রদেশের মানুষের সঙ্গে মেলবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল, তেমনি মুঘল শাসনের আওতায় এসে ঘুচে গেলব াঙালীর রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সংকীর্ণতা। বাঙালী কবিদের কলমে বাজলো 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' ভাবনার কাব্যিক প্রতিধবনি। ত্রিবেনীর নিকটস্থ সপ্তগ্রামে বসে ১৫৭৯ -তে যে-কাব্য লেখেন দ্বিজ মাধব, সেই 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'-এ সম্রাট আকবরের প্রভ াব তুলিত হয়েছে মহাভারতীয় ধনুর্ধর অর্জুনের বীরত্বের সঙ্গে। তাঁর বুদ্ধি বৃহস্পতিতুল্য, আর প্রজানুরঞ্জকতায় তিনি 'কলিযুগে রাম'। আকবরের জমানার শেষ দিকটায় বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন রাজা ম ানসিংহ। ইনি স্বীয় ক্ষমতাবলে একদা গৌড়বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধীশ্বর হয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে ডিহিদারী অত্যাচারের সাতপুষের 'মিরাস' ছেড়েও কবিকঙ্কণ মানসিংহের প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হন না। 'ধন্য রাজা মানসিংহ / বিষ্ণু পদাম্বুজভৃঙ্গ'-এই স্তুতিবচন লিখে তিনি কি পোষ্টা রাজা বাঁকুড়া রায়ের পক্ষ থেমে মুঘল প্রশাসকদের আনুকূল্য কুড়োতে চেয়েছিলেন? সত্যি, কবিদের দাস - মনোবৃত্তির এ এক আশর্চ্য অভিপ্রকাশ। এই মানসিকতার কারণেই কি মনুষ্যসৃষ্ট অরাজকতা ও লোভী কর্মচারীদের প্রজাপীড়নের তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েও অতবড় বাস্তবজ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন জীবনরসিক কবি অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে ঘোষণা করেন 'প্রজার পাপের ফল' বলে? আসলে অদৃষ্টবাদী মানসিকতাই সেদিন ঈশ্বর আর ঈশ্বরের প্রতিভূ রাজার প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য করেছিল সাধারণ মানুষকে।মুকুন্দের গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে, অসাধু কর্মচারীদের অন্যায়ের সঙ্গে একা মোকাবিলা করা অসম্ভব জেনে উপদ্রুত সহ ায়-সম্বলহীন কবি নিজ জন্মভূমিতে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে ঘোর রাজনৈতিক দুর্বিপাকের দিনে স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে সাত

পুষের বসতবাটি ছেড়ে অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন। এক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস তাঁকে চূড়ান্ত ভরসা দিয়েছিল। অন্যদিকে ভাগ্য তাঁর ভালোই ছিল বলতে হবে। কেননা আরড়াপতি ভূস্বামী বাঁকুড়া রায় কবিত্ববাণী শুনে পাঁচ আড়া ধ ান দিলেন পারিতোষিক হিসেবে, আর স্থায়ী নির্ভরতা দিলেন শিশুপুত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত করে। বিপন্নের কাছে যিনি বয়ে আনেন এ হেন নিশ্চিন্ততা, তিনি তো অবশ্যই 'নরপতি' এবং 'ব্যাসের সমান' ; আর যে-শিশুপুত্র একদা তাঁর শিষ্য, তিনি এখন কবির পৃষ্ঠপোষক হওয়ার 'ধন্য' ও 'রাজগুণে অবদাত'। একজন সামান্য সামন্তরাজাকে কবির চাটুকারিতা করতে বাধে না

শ্রী রঘুনাথ নাম অশেষ গুণধাম
ব্রাহ্মণভূমি - পুরন্দর।
তাহার সভাসদ রচিয়া চাপদ
মুকুন্দ গান কবিবর।।১১

শুধু কবিকঙ্কণের ক্ষেত্রেই নয়, মধ্যযুগে এই শ্রেণীর রাজ-তোষণ ও কবি - পোষণ সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে বিশেষ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল এর আরো অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে আরাকান সভায় পৃষ্ঠপোষিত কবিদের লেখায়। কা জির দৌলত রোসাঙ - রাজ থিরি - থু-ধম্মার প্রধান অমাত্য ও সমরসচিব আশরাফ খানের অন্নজলে প্রতিপালিত ছিলেন। আশরাফ রাজনীতি ও রাজ্যশাসনে যেমন বিচক্ষণ ছিলেন, তেমনি ছিলেন সাহিত্যেরও একজন রসজ্ঞ বোদ্ধা। দৌলতের কলমে এই অন্নদাতা প্রভুটি ষোলকলাবিশিষ্ট চন্দ্রমাতুল্য - যাঁর নীতিবিদ্য, কাব্যশাস্ত্র ও রসসাহিত্যে নাকি অদ্ভুত পারঙ্গমতা। রোসাঙের অন্য কবি মরদন; আবির্ভূত হন দৌলতের সমকালে। তাঁর লেখা 'নসীরানামা'য় রাজার ভূয়সী প্রশংসা

ভোবন বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গ নগরী।
শ্রি শ্রি সুধর্ম্ম সাহা তথাত ঈশ্বর
ছত্র অ ধবল গজ লোক অধিপতি।
ব্রিঅস্পতি সম বুদ্ধি দানে কর্ণ সম।২২

ঐ রাজসভারই কবি সৈয়দ আলাওলের জীবন নাটকের চেয়েও ঘটনাবহুল। নানা সময়ে নানা পরিস্থিতিতে তাঁকে অ াসতে হয়েছে বিভিন্ন রাজপুষের সংস্পর্শে । তাঁর বিভিন্ন কাব্যে সেইসব পোষ্টাদের প্রতি কবির সশ্রদ্ধ ভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শিত হয়েছে। সান্দু-থু-ধম্মার প্রধানমন্ত্রী মাগনের কণা - লাভে- ধন্য কবির স্বীকারোক্তি

তালিব আলিম বুলি মুঞি ফকিরের।
অন্ন বস্ত্র দিয়া সতেব পোষেন্ত আদরে।।১৩

এইরকমই রাজ-অমাত্য সৈয়দ মুসার প্রশংসা মেলে 'সয়ফুলমুলক - বদিউজ্জমাল'-এর শেংষাশে, 'সেকেন্দারনাম া'য়নজরে পড়ে শ্রীযুক্ত মজলিস কুতুবের গুণগান, যিনি 'অতুল মহন্ত'; যাঁর--

মধুর বচন মোর শুনিবার সাধ।
সাদরে আনিয়া আমা দিলেক প্রসাদ।।১৪

অতএব 'প্রসাদ'-পুষ্ট কবির আর কোনদ্বিধা থাকে না কাব্য রচনায় কিংবা সপ্রশংস পোষ্টা - বন্দনায়।

মুসলমান কবিদের মধ্যে আরো অনেকেই পোষ্টাস্তুতিতে মুখর ছিলেন। উদাহরণ হিসেবে নাম করা যাক 'নূরনামা'-র লেখক আবদুল করিম খোন্দকার, 'মল্লিকার হাজার সওয়াল' রচয়িতা শেখ সেরবাজ চৌধুরী ও 'নসলে উসমান' ক াব্যের কবি মুহম্মদ উজির আলীর। তাঁরা যথাত্রমে রোসাঙের কোষাধ্যক্ষ আতিবর, বিদ্যোৎসাহী ও ধনবান সৈয়দব ায়েজিদ ও হাটরাজারীর শাহজাদা নাজির আলীর প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, এঁদের দ্বারা কবিত্রয় কদাচিৎ অনুগ্রহ-পুষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের লেখাতেও সে - আভাস রয়েছে। আবার কোন কোন কবি অনুগ্রহ - প্রাপ্তির ঘটনাকে টেনে নিয়ে গেছেন পূর্বপুষের কালে। পুষানুত্রমিকভাবে প্রাপ্ত সেই রাজানুগ্রহ বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখি 'লায়লীমজনু'র কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের কলম। বেশ ফলাও করে জানিয়েছেন

এই প্রসাদপুষ্টির কথা। বাহরামের পূর্বপুষ হামিদ খান তৎকালীন গৌড়াধিপতি আলাউদ্দীন হুসেন শাহেরপ্রধান সচিব ছিলেন। অতএব কবির লেখনী প্রথমত হুসেন শাহের গুণগানে পঞ্চমুখ। হামিদেরও 'গুণের অন্ত নাই'। তাঁর গুণপনার পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন মসজিদ, পুষ্করিনী, অন্নশালা প্রভৃতি স্থাপনা কথা। নৃপতি হুসেন অতঃপর উজিরের ধর্মের অনুরাগ উপলব্ধি করে তাঁকে ভালোবেসে 'প্রসাদ করিলা দুই সিক'। এইভাবে জায়গীরস্বপ চট্টগ্রামের দুই সিক বা পরগনা লাভ করে হামিদ সপরিবারে চলে আসেন চট্টগ্রামে। কালে চট্টগ্রাম নিজাম শাহের অধিকারভুক্ত হয়। এই নিজামেরই দরবারের কবি হলেন মুবারক ও তৎপুত্র বাহরাম। ফলত কাব্যে নিজামেরও প্রভুত প্রশংসা আছে। অথচ নিজাম শাহ শূর ছিলেন আরাকানরাজের নিযুক্ত একজন ক্ষুদ্র শাসনকর্তা মাত্র। তিনি সামান্য জায়গীরদার হিসেবেই পরিচিত। আর কবি নিজামের দেওয়ান হয়ে ভাষায় তাঁকে বানিয়েছেন 'নৃপতি' এবং নিজে হয়েছেন 'দৌলত উজির'

চাটিগ্রাম অধিপতি হইলেন্ত মহামতি
নৃপতি নেজাম শাহা সূর।
একশত ছত্রধারী শভানের অধিকারী
ধবল অণ গজ্বের।।১৫

বৃহত্তর বঙ্গ মুঘল প্রশাসনের এত্তিয়ারে চলে গেল ত্রমশ স্বাধীন নবাব কিংবা সুলতানদের অস্তিত্ব লোপ পেতে থাকে। তবুও রাজস্ব ও আনুগত্যের বিনিময়ে অখণ্ড বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে দু'চারটি হিন্দুরাজার অস্তিত্ব শেষ অব্দি টিকে ছিল। এগুলির মধ্যে অন্যতম কোচবিহারের কামতা রাজসভা, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের দরবার, বর্তমান রাজসভ া, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবার। এক- এক দরবারে সাহিত্যচর্চার এক-এক প্রকার বিশেষত্ব ছিল। কামতায় চলেছিল রামায়ণ, মহাভারত ও সংস্কৃত পুরাণের অনুবাদচর্চা। কোচবিহারে কোচরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজবিশ্বসিংহ থেকে শু করে পরে উজির মহীনারায়ণের সাত-আট জন বংশধরের রাজত্বকালে অন্তত ৩৫/৪০ জন কবি পৃথক পৃথক সময়ে আবির্ভূত হন। হেম সরস্বতী, কবিরত্ন সরস্বতী, হরিহর বিপ্র, পীতাম্বর, অনন্ত কন্দলী, রাম সরস্বতী, কবীন্দ্র পাত্র, দ্বিজ কল্যাণচন্দ্র, গোবিন্দ মিশ্র, গোবিন্দ কবিশেখর, বিশারদ চত্রবর্তী, রামের, শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ, দ্বিজরাম, দ্বিজ কবিরাজ প্রমুখ খ্যাত-অখ্যাত কবির বিদ্যোৎসাহী রাজন্যবর্গ কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। রাজাদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন কবিত্বগুণসম্পন্ন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ নিজেই রামায়ণ ও মহাভারতের নানা অংশ অনুবাদ করে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি এতটাই কাব্যরসিক ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে কেবল তাঁর সময়েই বিশ জন অনুবাদক কবিকে পাচ্ছি আমরা। অন্যদিকে বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণের রাজত্বকালে সভাকবি ও পণ্ডিতদের যুগপৎ সাহিত্যচর্চ ায় রাজসভা জমজমাট হয়ে উঠে। এই সময়েই আসাম থেকে আসেন বৈষ্ণবগু শঙ্করদেব। তাঁর বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের অ ান্দোলন রাজসভার শাক্ত ভাবধারাকে লঘু করে দেয়। পরিবর্তে সংস্কৃত পুরাণচর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় রাজভ্র াতা শুক্লধবজ বা চিলা রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়। যাইহোক, এই রাজসভার প্রায় অধিকাংশ কবিই তাঁদের বদান্য হিতৈষী রাজন্যবর্গের বিপুল প্রশংসা করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো ঘটনা রাম সরস্বতীর পেট্রন-বন্দনাটি। তিনি কেবল পোষ্ট-রাজা নরনারায়ণের কীর্তিকে ব্যতিরেক অলংকারে সাগরাতিত্রমী বলে বর্ণনা করে অভিনবত্ব দেখান না, বরং দেবতা- বন্দনার পূর্বে পেট্রন - বন্দনা করে একজন কবির কাছে এই দুইয়ের অবস্থান ও গুত্বকে বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করেন। স্মরণীয় যে অনুবাদের সুবিধার জন্য রাজভ্রাতা শুক্লধবজ বলদের গাড়িতে করে মহাভারতের যাবতীয় পুথি কবির কাছে প্রেরণ করেছিলেন, আর দেওয়া হয়েছিল পর্যাপ্ত পরিমান খাদ্যসম্ভার ও দাসদাসী - যাতে কবি নিশ্চিন্ত মনে কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। এই ছিল তাহলে রাজাদের কবি - পোষণের চেহারা। তাঁরা স্বকীয় আভিজাত্য বজায় রাখতে যেমন রাজকীয় ভোজন- শয়ন - বিলাস - ব্যসন - পোষাক - পরিচছদের আয়োজন করতেন, তেমনি রসিক হিসেবে পরিচিত করাতে গিয়ে ধনসম্পদ -জমি- গ্রাম- খেতাব ইত্যাদি দানে কবিদের তুষ্ট করে লিখিয়ে নিতেন কাব্য-কিস্সা-গান-আখ্যান। পক্ষান্তরে কবিরাও প্রশস্তি-পাত্র উপুড় করে দিতেন কাব্যের পাতায়। দু'একটির উল্লেখ এখানে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমন কবি পীতাম্বর 'নল-দময়ন্তী' উপাখ্যান কাব্যে রাজা বিশ্বসিংহ ও রাজকুমার সমরসিংহের গুণগান করে লিখেছেন

কামতা নগরে ঝিসিংহ নরেশ্বর।
প্রতাপে প্রচণ্ড রাজা ভোগে পুরন্দর।।
তাহার তনয় সে সমরসিংহ নাম।
মহামায়া চরণে ভকতি অনুপাম।।১৬

বীরনারায়ণের রাজসভায় মহাভারতের কিরাত পর্বের অনুবাদ করেন গোবিন্দ কবিশেখর। পৃষ্ঠপোষক রাজার বদান্যত ায় মুগ্ধ কবি তাঁকে দাশরথি রামের সঙ্গে তুলনা করে লেখেন

দশরথ - রাম প্রায় বীরনারায়ণ রায়
যশকীর্তি গুণের বিধান।
তাঁর আজ্ঞা পরমাণে ভাষাবন্ধে সুবন্ধনে
কবিশেকর নিরমান।।১৭

কামতার কবিদের মতো অনুবাদ - চর্চায় বেশি মনোযাগী হয়েছিলেন বিষ্ণুপুর রাজসভার কবিরাও। ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দেধ াড়িমল্লের পুত্র বীর হাম্বির বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকে ঐ রাজসভাকে ঘিরে বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির নতুন জোয়ার বইতে থাকে। বিশেষত শেষ জীবনে বৈষ্ণব গু শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষা নেন হাম্বির, নাম হয় তাঁর 'চৈতন্যদাস'। ঐ নামে পদও লেখেন কিছু। হাম্বিরের পর তাঁর সমস্ত উত্তরপুষেরা বংশগত ধর্মাচরণকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন ও সেই সূত্রে বৈষ্ণবীয় পুরাণ গ্রন্থগুলির অনুবাদে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এই রাজসভার বিশিষ্ট কবি পাঁচটি গ্রন্থের রচয়িতা শঙ্কর কবিন্দ্র (যিনি দ্বিজ কবিচন্দ্র নামেও খ্যাত) 'শিবমঙ্গল'-ে রাজা বীরসিংহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, আর বিষ্ণুপুরী মহাভারতে বিস্তৃতভাবে প্রশস্তি করেছেন রাজা গোপালসিংহের। শেষোক্ত রাজা যে তাঁকে বীরবৌলী দিয়ে সম্মান জানান, আর ভূমিদান করে স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেন সে-কথাও উল্লেখ করতে ভোলেন না পানুয়া গ্রামবাসী এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কবি

শ্রীযুক্ত গোপাল সিংহ প্রবল প্রতাপ।
যার কীর্তি দেখিলে ঘুচয় মনস্তাপ।।
নৃপ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাগ্র সবাকার মান্য।
পরম দেবতা সদা ভাবেন চৈতন্য।।
হেন রাজা সমাদরে লইয়া আদরে।
বীরবৌলী নিজে দিলা পরম সাদরে।।
তারপর মহারাজা দিয়া ভূমিদান।
আদেশিলা রচ মহাভারত পুরাণ।।১৮

কীভাবে রাজানুগ্রহে বন্দী করে কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে দিয়ে কাব্য লিখিয়ে নেওয়া হতো দ্বিজ কবিচন্দ্রের এই বর্ণনা তার লিখিত প্রমাণ। শঙ্কর ছাড়া ঐ রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন 'শ্রীপ্রকাশ রস'-এর রচয়িতা উত্তম দাস, 'ধর্মমঙ্গল'-এর কবি রামচন্দ্র বাঁড়ুয্যে ও প্রভুরাম মুখুয্যে। গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, অনন্তলালা চক্রবর্তী, কৃষ্ণনাথ, দ্বা রিকনাথ, শ্যামচাঁদ গোস্বামীর মতো প্রখ্যাত সব সঙ্গীত গায়কেরা মিলে গড়ে তুলেছিলেন বিষ্ণুপুর রাজসভার ধ্রুপদী সঙ্গীতের নিজস্ব ঘরানা। অনুমান করা যায় এঁরাও বিপুল অর্থের দ্বারা পৃষ্টপোষিত ও দুর্লভ সম্মানের দ্বারা সংবর্ধিত হয়েছিলেন।

বর্ধমান রাজসভার সূচনা সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি হলেও কবি ও পণ্ডিতের সম্মাননা পেতে থাকেন অষ্টাদশ শতকের সূচনা ভাগ থেকে ; যখন ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে জগৎরামের পুত্র রাজা কীর্তিচন্দ্র রায় সিংহাসনে আরোহন করলেন। তাঁর শাসনকাল দীর্ঘ। প্রশাসনেও তিনি সুদক্ষ। তিনি একদিকে যেমন দুর্ধর্ষ বর্গীদের আক্রমণ প্রতিহত করে স্বীয় বাহুবলের পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনি গুণগ্রাহিতার পরিচয় রেখেছিলেন রাজসভায় কবি-পণ্ডিতদের সমাদর জানিয়ে। সেখানের অদ্বিতীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে প্রচুর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ও ত্রিবেণীতে পুষ্করিনী দান তাঁর দানশীলতারর পরিচ

ায়ক। তিনি যে নানাবিধ কীর্তিতে ভূষিত সার্থকনামা ভূস্বামী সেকথা যমক অলঙ্কারে জানাতে ভোলেননা তাঁরই অনুগ্রহ - ধন্য ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। কবি লিখেছেন

অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান।।১৯

এই কীর্তিচন্দ্রের সভাতেই লিখিত হয়েছিল নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের শীতলামঙ্গল ও অকিঞ্চন চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল। পরবর্তী রাজা চিত্রসেনের রাজসভার শ্রেষ্ঠ অলংকার কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাঁর 'চিত্রচম্পূ'সংস্কৃত ভাষায় লেখা রূপক কাব্য, যা একই সঙ্গে পৃষ্ঠপোষক রাজা চিত্রসেনের চরিতকাব্যও বটে। শুধু রাজা নন, কবির স্বগ্রামবাসী মন্ত্রী মাণিক্যচন্দ্রেরও নানা গুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়ে এসেছে লেখনী মুখে। কাব্যটি বিষয়ে জানতে গিয়ে অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রাজসভার কবি ও কাব্য' গ্রন্থে লিখেছেন ''রাজা চিত্রসেনের প্রশস্তি করতে বসে বাণেশ্বর কাব্য সূচনায় সংস্কৃত ও মহাকাব্যের আদর্শ অনুযায়ী আদর্শ রাজার যাবতীয় গুণাবলী চিত্রসেনের উপরে আরোপ করে রাজার দৈনন্দিন দিনযাপনের একটি দিনলিপি কাব্যমধ্যে উপস্থিত করেছেন।'' এ কাব্যে বর্গীর আক্রমনের ইতিহাস বিবৃতির তুলনায় রাজস্বপ্নের বর্ণনার অজুহাতে রাজস্তুতির ব্যাপকতা লক্ষিত হওয়ায় বোঝা যায় অনুগৃহীত কবি ইতিহাস-নিষ্ঠাকে বিসর্জন দিয়ে রাজ-মনোরঞ্জনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

মধ্যযুগের এই নির্জলা স্তাবকতার প্রথাটাই তো চলে আসে উনিশ শতকের সূচনাভাগে। ১৮২০ সালে বর্ধমানের যুবরাজ প্রতাপচাঁদ নিখোঁজ হওয়ার আগে বিখ্যাত গায়ক ওগীতিকার কালীমির্জা ঐ সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি তাঁর 'শ্রীশ্রী কালীকুণ্ডলিনী' কাব্যে তেজচাঁদের এই পুত্রের প্রভূত সুখ্যাতি করে লেখেন

তেজচন্দ্র তনয় প্রতাপচন্দ্র নাম।
সর্বজনপ্রিয় আর সর্বগুণধাম।।
সর্বত্র সুযশ ছিল সর্বত্র সম্মান।
কার্যে সুপ্রখর বুদ্ধি শাস্ত্রে সুবিদ্বান।।
ছোট মহারাজ বলি খ্যাতি ছিল যাঁর।
ধর্মপ্রাণ ধীর চিত্ত সুচিন্তা ভাণ্ডার।।২০

এই রাজসভাতেই রাজা তেজচাঁদের আমলেই লেখা হয়েছিল 'বর্ধমানের বিদ্যাসুন্দর' কবি প্রাণচন্দ্রের 'হরিহরমঙ্গল'। কবি রাজার বদান্যতায় এতটাই আপ্লুত যে, 'বর্ধমান' শব্দের নবতর ব্যাখ্যায় নৃপতি কর্তৃক মানীগণের মানবর্ধনের কথা সোল্লাসে জানান। রাজার নামটিও বিশ্লিষ্ট হয়েছে তিমির বিনাশক দিনেশ অর্থে। বর্ধমানের সঙ্গে কবি তুলনাদেন রঘুবংশীয় নগরী অযোধ্যার; ফলত রাজা ও রানী কবির প্রশস্তি- বচনে আদর্শ দম্পতির প্রতীক রাম-সীতারই আধুনিক সংস্করণ বলে উল্লিখিত হয়েছেন।

সবশেষে আসা যাক নদীয়ার কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার কথায়। এ বংশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৬ খ্রী.) প্রতাপাদিত্য বিজয়ে সাহায্য করার জন্য দিল্লীর দরবার থেকে প্রভূত সম্মান ও চৌদ্দটি পরগণার জমিদারী ফরমান পেলেও তাঁর পৌত্র রাঘব রায়ের সময় থেকেই রাজসভা জমজমাট হয়ে উঠতে থাকে। ভবানন্দের অধস্তন ষষ্ঠ পুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই রাজধানী কৃষ্ণনগর সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চায় সমগ্র বাংলার মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। তাঁর সভাতে সংস্কৃত কবি হিসাবে পাই বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে (যিনি পরে বর্ধমান রাজসভায় যান), শাক্তসাধক কবিবর রামপ্রসাদ সেনকে ; এছাড়া সভাপণ্ডিত রূপে ছিলেন কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্বভৌম, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, প্রাণনাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ প্রসিদ্ধ বিদগ্ধজন এবং অবশ্যই ঐ রাজসভার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার কবিপুষ রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। এ রাজসভা প্রথমাবধি শাক্ত ভাবধারায়নিস্নাত। মহারাজাও

ছিলেন দেবীভক্ত। রাজা স্বয়ং ও তাঁর পুত্রদ্বয় শিবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র একদা শাক্তপদ লিখে খ্যাতিলাভ করেন। ধর্মবুদ্ধির পাশাপাশি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধি। তাঁর কূটনৈতিকতার পরিচয় পাওয়া যায় সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী পিতৃব্যকে কৌশলে সরিয়ে রাজ্য করায়ত্ত করার ঘটনায়। আবার যথেষ্ট পরিমাণে বিলাসীও ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, ছিলেন জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত ও কবিব্যক্তির আশ্রয়স্থল। স্বভাবতই তাঁর অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছেন কবি ও সভাপণ্ডিতের দল। প্রসাদপুষ্টরা অবশ্যই তাঁর প্রতি অনুগত ছিলেন। আর সেই আনুগত্যেরজোরেই ভাটপাড়া-শান্তিপুর-কুমারহট্ট-নদীয়ার হিন্দুসমাজের সর্বেসর্বা বিধানদাতা ও ব্যবস্থাপক দণ্ডদাতা ছিলেন তিনি। এই দোর্দণ্ড প্রতাপ নৃপতির রাজসভায় চল্লিশ টাকা মাসিক বৃত্তিধারী ভারতচন্দ্র অতুলনীয় কবিত্বশক্তির অধিকারী হয়েও পোষ্টাস্তুতি করতে বাধ্য হয়েছেন। সে প্রশস্তি থেকে বাদ যান না রাজার দুই পক্ষের ছয় পুত্র, তিনি জামাতা, একাধিক জ্ঞাতি, দুই ভগ্নিপতি, চার ভাগ্নিজামাই, পিসে, এমনকি পিসের জামাতৃগণও। এঁদের নিয়েই ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের বিদগ্ধসভা। সে সভার মধ্যমণি রাজা স্বয়ং, যিনি গগন-চন্দ্রের চতুর্গুণ কলায় আলোকিত উজ্জ্বল। কবি স্তাবকতার চূড়ান্ত করে ছাড়েন, যখন লেখেন

চন্দ্রের সবে ষোল কলা হ্রাসবৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।।
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে।।
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল।।
দুই পক্ষ চন্দ্রের সিত অসিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়।।২১

তাছাড়া 'সম্বাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক সাংবাদিক-কবি ঈশ্বর গুপ্তের কল্যাণে সকলেরই এ তথ্য জানা যে ভারতচন্দ্র'অন্নদামঙ্গল' রচনার নির্দেশ পেয়ে দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য ও কৃষ্ণনগর রাজবংশের অতিরঞ্জিত প্রাচীন ইতিহাস (যা দৈবী তথা অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় কৃষ্ণচন্দ্রের তৎকালীন কারাবাসের কলঙ্ককে মুছে ফেলার ক্ষেত্রে নক্তক-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছিল) যথাক্রমে 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' ও 'মানসিংহ' পালায় লিপিবদ্ধ করলেও আদিরসে রসিক রাজা কবির প্রতি সম্পূর্ণ প্রসন্ন হতে পারেনি। পরে রাজার ইঙ্গিত বুঝে বিদ্যা ও সুন্দরের অবৈধ প্রণয়কাহিনী যুক্ত করে দেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতি উৎপাদনের পুরস্কার স্বরূপ 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত হন। শুধু অনর্থক উপাধি নয়, কাব্য রচনার সুবাদে কবির ভাগ্যে জুটেছিল গঙ্গাতীরবর্তী মূলাযোড় গ্রাম আর কিছুদিনের সুখশান্তি।

আসলে এ সবই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির জালে জড়িয়ে পড়া যুগের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত অসহায় মানুষের ছবি। কৃত্তিবাস থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত কবিদের সুদীর্ঘ মিছিলে কত শত খ্যাত-অখ্যাতদের আনাগোনা হয়েছে কাল তার হিসেব রাখেনি। মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব আলো - আঁধারির এই সময়টায় গোষ্ঠীতন্ত্র আর রাজতন্ত্রের বধ্যভূমির সামনে দাঁড়িয়ে থরথরিয়ে কাঁপছে। সাহস করে মুখ খুলে কে - ই বা তখন বলবে--'নিত্য তুমি খেল যাহা/ নিত্য ভাল নহে তাহা/ আমি যে খেলা খেলিতে চাহি সে খেলা খেলাও হে।' অতএব নতমস্তকে রাজাদেশ শিরোধার্য করে কবিরা একের পর এক লিখে গেছেন চণ্ডী - মনসা - ধর্ম- ভবানী - কালিকার মাহাত্ম্য কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারত - ভাগবতের অনুবাদ কিংবা মানবরসাশ্রিত বিশুদ্ধ প্রণয় কাব্যের চিত্তচমৎকারী আখ্যান। শক্তিমান স্রষ্টার সৃষ্টিটুকুই মূল্য পেয়েছে, কবির নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও গুত্ব কোথাও স্বীকৃতি পায়নি। সামন্তযুগের এমনই মহিমা। তাই তো মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ও সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র তাঁর স্ব-কালের দাবী ও সীমাবদ্ধতা এড়াতে পারেন না, পারেন না পৃষ্ঠপোষকের অশুচি মর্জির বিরোধিতা করতে। মননের দিক থেকে আধুনিক হয়েও লেখেন মঙ্গলকাব্য, কলমের ডগায় কথার ফুলঝুরি ফুটিয়ে করেন পেট্রন-বন্দনা, আর নিজস্ব অভিচির বাইরে পা বাড়িয়ে বিদ্যাসুন্দরের পাঁকে কবিত্ববুদ্ধিকে ডুবিয়ে দেন। কেননা তাঁর মতন বুদ্ধিমান কবি হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিলেন এ সত্য 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার।' উপায়ান্তর না - থাকাই মধ্যযুগের কবিদের একমাত্র ভবিতব্য। আর সেই উপায় তৈরি হয় নতুন অর্থনৈতিক পরিবেশে, বণিক

ইংরেজদের সৃষ্টি রাজধানীতে। পুরাতন রাজসভাগুলো অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সভাকবির পশরা মাথায় গান ফেরি করতে পথে নামলো। সাহিত্যের বিশুদ্ধ রসের বদলে 'আমোদের উত্তেজনা'ই পরিবেশিত হতো সেইসব গানে। এই দীনহীন ব্যবসায়ী স্বভাবের কবিওয়ালারাই ছিলেন প্রথম আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধে উদ্দীপ্ত সাহিত্যভাবুকের দল। জনসাধারণের স্থূলচির আসরে নিজেদের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন বলে ছিলেন সৎসাহসেরও অধিকারী। যে-সাহসে ভর করে কবিয়াল ভোলা ময়রাই সর্বপ্রথম স্থাবকতার বিদ্ধে প্রশ্ন তুললেন। প্রতিপক্ষ সহাধ্যায়ীর তোষামোদী স্বভাবকে কটাক্ষ করে নির্ভীকভাবে জানালেন

কেমন করে বল্লি জগা জাড়া গোলোক বৃন্দাবন
কবি গাবি পয়সা পাবি তোষামোদী কি কারণ?২২

বাণিজ্যভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থার সামাজিক প্রতিক্রিয়াটি ধরা পড়েছে কবিওয়ালার এই গানে। এরই সঙ্গে সাঙ্গ হলো পেট্রন - পোষিত মধ্যযুগ। তার নিকষ কালিমা ঘুচে গিয়ে দেখা দিল এক টুকরো ঊষার আলো। তারপর এই পথ ধরে অগ্রসর হতে হতে প্রখর রবির আলোক ক্রমশ এসে উদ্ভাসিত করে তুললো বঙ্গ-সাহিত্য - ভারতীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখশ্রী।